বৈষ্ণব পদাবলী ঃ আধুনিক কবিতার অনুষঙ্গে

সত্যবতী গিরি

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য ঐশ্বর্য্য। সেই কবিতার আবেদন এখনও বাঙালি কবিতা পাঠকের কাছে হারিয়ে যায় নি। কিন্তু এর- পরও আমরা দেখি আধুনিক বাংলা সাহিত্য নানাভাবে চলে আসে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুষঙ্গ। এ-ক্ষেত্রে T.S. Eliot -এর Traditon and Individual Talent -এর প্রাসঙ্গিক কথাটুকু আমাদের মনে পড়ে যায় - / No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead-poets and artist. You cannot value him alone.*

তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবসম্পদ ও রূপসম্পদ। তাঁর প্রথমদিকের 'মানসী' কাব্য গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতাতেই তিনি বর্ষার মেঘমেদুর পরিবেশে শ্রী-রাধার অভিসারের কথা মনে করেছেন। 'ছিন্নপত্রে'র কোনো কোনো অংশে অনিবার্যভাবে এসেছে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের' 'পসারিণী' কবিতাটি। এই কবিতার প্রেরণা স্পষ্টতই ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য সমসাময়িক কবি বংশীবদনের দানলীলার একটি পদ থেকে পাওয়া। বংশীবদনের পদটিতে কৃষ্ণও রাধাকে অনুরোধ করেন; এই তপ্ত দ্বিপ্রহরে রাধা যেন আর না যান, রাধার পসরা কৃষ্ণই সব কিনে নেবেন। কৃষ্ণের চোখ দিয়ে দেখা মধ্যাহ্নের খরসূর্যতাপে ঘর্মাক্ত রাধার চিত্রটি অঙ্কন বংশীবদনের প্রতিভার পরিচায়ক -

রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভারে আউলাইল করবী।

মনে হয় শ্রমক্লান্ত রাধা আর ব্যথিত কৃষ্ণের মমতাকাতর চোখের দৃষ্টি যেন একেবারেই জীবন্ত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'পসারিণী' কবিতায় এর প্রভাব পড়েছে। পসারিণীকে সম্বোধন করে কবিও কৃষ্ণের মতই বলেন - এতভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি/ কোমল কণ ক্লান্ত কায়/ বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধার বলেন -

মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনি।

আর রবীন্দ্রনাথ পসারিণীকে বলেন -

কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়।

বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন -

এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধুলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।

রবীন্দ্রনাথ বলেন-

মধ্য দিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে
দগ্ধ পথে ওড়ে তপ্ত বালি।

বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন -
শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার কোলে
সকলি কিনিয়া লব আমি।

কৃষ্ণের কণরঙীন, কোমলমধুর প্রেম এইভাবে আধুনিক যুগের কবির কাব্যকেও স্পর্শ করেছে।
অনেক সময় বৈষ্ণব পদাবলী নয়- তার নায়ক কৃষ্ণের পৌরানিক ইমেজও উঠে এসেছে আধুনিক কবিদের কবিতায়। এক্ষেত্রে হয়তো মিথের শিকড় সেখানে গভীরে যায় নি, কিন্তু তার আর্কিটাইপকেই গ্রহন করা হচ্ছে। একই মিথ বিভিন্ন শিল্পীর হাতে পরিবেশিত হয়ে থাকে ভিন্নভাবে। বৈষ্ণব পদাবলী তথা কৃষ্ণকথার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।
আর সেই কারণেই বিষ্ণুদে'র নাম রেখেছি ' কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের 'সন্ধ্যা রাত্রি ভোর' কবিতায় ছোটো ছোটো মেঘ' হাজার ধবলী স্থির। তারা 'কার বাঁশি শোনে'।
এই একই কবিতায় বলরামপুরের জঙ্গলে রূঢ় কঠিন পাহাড়ের ওপরের আকাশে গতিশীল মেঘ দেখে কবির মনে হয়-
আর ছোটে দঙ্গলে দঙ্গলে অন্ধও অসাড় মৃত্যুভয়ে ঘেরা অসহায় গোপিনীর মতো ছোটে পান্ডুর মেঘেরা।
ভাগবতের - ভাগবত প্রভাবিত রাসলীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে পুরোপুরি নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দিয়ে কবি বলেন -
যেন কোনো লঙরের খাওয়ার সন্ধানে
কলকাতার পথে পথে অনাহারী ভিড়ে
ভিখারী স্বামীর পিছে চলে পতিব্রতা
কিংবা কোনো কাঁদুনে বোমায় ডালহৌসীর ফেরারি জনতা। এক্ষেত্রে ক্লোদ ভেলি স্ত্রোস পুরাণের নব রূপায়নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমরা উদ্ধৃত করতে পারি-
mythology would be held to be reflection of the social structure and of social relations. And observation contradicts the hypotheses they will immediately suggest that the proper object of my tho is to offer a dervator to real but compressed sentiments.
আসলে পুরোনো ক্লাসিককে নতুনভাবে ব্যবহার কার যেন অনেক রহস্যময়-অনেক অচেনা অন্ধকার থেকে কিছুটা সংশয় আর কিছুটা অপরিচয়ের সংকট ঠেলে সরিয়ে তুলে আনা স্বয়ংপ্রভ মনির প্রেমে ধন্য হয়ে যাওয়া।
বৈষ্ণব পদাবলীর একদিকে আছে এক রূপবান কিশোর তার প্রেমে পাগল অসংখ্য যুবতী, তাদের ফেলে চলে যাওয়া- কোনদিনই ফিরে না আসার নিষ্ঠুর যন্ত্রণা।
আবার অন্যদিকে রাধার সর্বস্বত্যাগী একনিষ্ঠতার বিপরীতে তাঁর অবিশ্বস্ততা আর আপাত বহুচারিতাও কৃষ্ণসম্পৃক্ত আধ্যাত্মিকতার আবরণকে সরিয়ে এক কৌতুকতরল লঘুতায় লিপ্ত করেছে তাঁর চরিত্রকে - প্রবাদে প্রবচনে যার অবধারিত প্রকাশ।
আধুনিক কবিরা নিজস্ব জীবন আর জীবন ভাষ্যের সংস্পর্শে এই পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় কাব্য নায়ক চরিত্রকে নতুন ডাইমেনশন দেন। বিষ্ণু দে-র অনেক পরবর্তী কবির লেখা কবিতায় আমরা খুঁজে দেখতে পারি কৃষ্ণের নতুন নির্মিতিকে।
১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল জয় গোস্বামীর 'আজ যদি আমাকে জিজ্ঞেস কর' কাব্য গ্রন্থটি। এরই একটি খুব পরিচিত মুখে মুখে ফেরা কবিতা - 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'। জয় গোস্বামীর কবিতায় কালো নিম্নবিত্ত বাঙালি মেয়েরা বারবার আসে। তারা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ' মেজাজ' কবিতার নায়িকার মতো স্বামীর গোপন চুম্বনে অভিষিক্ত হয়ে ভাবী সন্তানদের নাম 'আফ্রিকা' রাখার স্বপ্ন দেখতে পারে না। তাদের জীবনে প্রেম আসে প্রতারণাময় ইন্দ্রজালের ক্ষণিক বর্ণাঢ্যতায়। তাদের জীবনে পরবর্তী অন্ধকার এত সান্ত্বনাহীন - নিম্নবিত্ত জীবনের সেই অন্ধকারে বসে বেদনা রোমন্থন ও এক স্বপ্ন বিলাসমাত্র। 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' সেই দিশাহীন নিরাশ অন্ধকারে ঘেরা বাস্তবের কবিতা। কবিতায় সে মেয়েটি তার প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলে তার নাম নেই। তার প্রেমিকের নাম বেণীমাধব কৃষ্ণের ইমেজ একবারই এনেছেন কবি-
বেণীমাধব, মোহন বাঁশী তমাল ত মূলে বাজিয়েছিলে .....
বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর সুরে মুগ্ধ ব্রজবালারা ঘর ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতায় পথে বেরিয়েছিল; আর

আধুনিক বেণীমাধবের মোহন বাঁশীতে ষোল বছরের এক কালো মেয়ের কুঞ্জে অলি গুঞ্জে মঞ্জরী ফোটে। তার বাবা দোকানের সামান্য কর্মচারী। রূপ নেই, সমাজিক সম্মান অথবা পরিচয় কিছুই নেই মেয়েটির। আধুনিক কৃষ্ণের সঙ্গেতার দেখা হয় ব্রীজের ধারে গোপনে। এই বেণীমাধব বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যায় না। নামহীন কালো মেয়েটি তার সুন্দরী প্রেমিকার সঙ্গে তাঁকে দেখে 'অপূর্ব আলোয়'। সে স্বীকার করে 'দুজনকেই মানিয়েছিল ভালো।' কালো মেয়েটি বাড়ি ফিরে চণ্ডীদাসের রাধার মতো বলতে পারে না-

যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া -
এমতি করিল যে
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।

বরং নিপায় হতাশায় সে বলে 'ওদের ভালো হোক্'। একতলায় ঘরে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে তার মনে পড়ে দিশাহীন দারিদ্রের অন্ধকারে চোরাপথেৰ বাঁকে হারিয়ে যাওয়া বোনের কথা। সেই বোনের ঠিকানা তার জানা নেই - জানা নেই নিজের আগামীকাল সম্পর্কেও। মধুর বিরহের বেদনা বিলাস নয়, বেঁচে থাকার তাগিদে নিছকই সেলাই দিদিমনি হয়ে যাওয়া মেয়েটি বেণীমাধবের কাছে প্রশ্ন রাখে সে নষ্ট মেয়ে হলে কেমন হয়। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারন মেয়ে'- র মতো স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাও তার নেই। মেয়েদের বিকল্পজীবনের কিছু উজ্জ্বলতার পাশাপাশি গাঢ়তার অন্ধকারের ছবি এই কবিতা। তাই কবিতার নাম 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' - সাধারন নিম্নবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের জন্য অনভিজাত স্কুল। তাদের জীবনেও কৃষ্ণ আসে -কিন্তু তারা কেউ রাধা হয়ে উঠতে পারে না। এই কবিতার বেণীমাধব কৃষ্ণ আজকের প্রজন্মের অবিশ্বস্ত প্রেমের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

পরবর্তীকালে রাখাল কবিতাটি কিন্তু কৃষ্ণেরই কবিতা। গোটা কবিতায় চুড়ান্ত অ্যান্টিরোমান্টিক বিদ্রুপ আর শেষ কবিতা পাঠকদের মনের নির্জ্ঞান স্তরের কৃষ্ণ মিথ্ কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আবারও জয়ের কবিতায় আসে পাড়ায় পাড়ায় কালো মেয়ের কথা। তাঁর কৃষ্ণ যদি ছন্দ হত তবে ছন্দ রাখাল কৃষ্ণকে তিনি অনুরোধ করতেন কালো মেয়েদের গতি করে দেওয়ার জন্য-

'তুই কিছু ব্যবস্থা কর, বরপক্ষ এত চাইছে
পেরে উঠবো না,
আজ কিংবা কাল
তোকে তো আসতেই হবে, তুই এসে ব্যাটাদের খিঁচে দিবি খাল সবাই তাকিয়ে আছে তোর দিকে কবির রাখাল।'

সম্ভবামি যুগে যুগে'র থিয়োরি মেনে নিয়ে কবির কৃষ্ণকে মর্ডানাইজেশানের এই চেষ্টা মিথের সঙ্গে মিশিয়ে, আর এই চেষ্টায় আজকের অ্যাভারেজ সামাজিক মানুষেরই তিনি একজন। 'মালতী বালা বালিকা বিদ্যালয়' - এর নায়ক - আজকের কেরিয়ারিষ্ট ফ্ল্যাট করা কৃষ্ণের পরিবর্তে আর এক কৃষ্ণ উঠে আসে 'রাখাল' কবিতায়। সমাজের আর এক স্তরের ভ্রষ্ট যুবশক্তি এই ওয়াগন ব্রেকার। সে বেণীমাধবের মত লেখা পড়ায় ভালো নয়, তার মুখে চাপ দাড়ি, গালে কাটা দাগ, লাল গেঞ্জি আর ঝাঁকড়া চুল নিয়ে সে চুল্লুর আড্ডায় বসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করে। তার লক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সুদামার লাশ ফেলে দেওয়া।

দুটি কবিতায় দুই সামাজিক পরিবেশ থেকে উঠে আসে কৃষ্ণ। কবি খুব নির্মমভাবে ভেঙে দিতে চান কৃষ্ণ সম্পর্কিত যাবতীয় রোমান্টিক মোহ, শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম। এই ভেঙে দেওয়ার ভিতর দিয়েই চিনিয়ে দেন যুগকে আর সমকালীন সমাজকে। দুটি কবিতায়-ই ব্রীজের তলার চালচিত্র। একটিতে ব্রীজ অভিসারের নিভৃত কুঞ্জের বিকল্প আর একটিতে কৃষ্ণ-বলরাম শ্রীদাম-সুদামের সখ্যরসের প্রবাহ সিক্ত গোষ্ঠীর বিকল্প। বৈষ্ণব পদাবলীর গোষ্ঠীলীলায় কৃষ্ণের মলিন মুখ দেখলে সখাদের বুক বিদীর্ণ হয়ে যায় আর এই কৃষ্ণ ও বন্ধুত্বের মূল্য দেওয়ার জন্য ইচ্ছে করে খেলায় হেরে যান। আর এই কৃষ্ণের লক্ষ্যই হল সুদামার লাশ ফেলে দেওয়া। বন্ধুত্ব প্রেম সব কিছুই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আর কোনোদিন ফেরা যাবে না বন্ধুতার আর প্রেমমুগ্ধতার সেই অনাবিল প্রসারে। কিন্তু এই স্মৃতিবেদনায় পাঠকের নিমজ্জন কবির উদ্দেশ্য নয়। তিনি চান সমকালীনতার সমস্ত নেতিকে চিনিয়ে দিতে আধুনিক কৃষ্ণ তাঁর সেই উদ্দেশ্যকেই সফল করে। সত্তরের দশকে বাঙালি

যুবকদের যে ভাবেই চিহ্নিত করা হোক না কেন তাদের সামনে ছিল একটা বড় আদর্শ। কিন্তু আশি-র দশকের শেষ থেকে গোটা নববই দশক জুড়ে একদিকে মধ্যবিত্ত তণদের আত্মকেন্দ্রিকতা আর অন্যদিকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবিত্ত সুযে াগবঞ্চিত তণ প্রজন্মের সমাজ বিরোধী হয়ে যাওয়ার বাস্তব পরিস্থিতিকেই কৃষ্ণমিথের আধারে পরিবেশন করেছেন কবি। জয় গোস্বামীর আরও নানা কবিতায় এই কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে নানা ভাবে। যেমন - 'আমাদের কথা ও কাহিনী' (দেশ; ২০ শ্রাবন ; ১৪০৭) নামে একটি কবিতায় কৃষ্ণকে তাঁর দেবত্ব থেকে ছেঁটে ফেলা কবি স্মিত কৌতুকে একটি ভিন্ন রূপ উপহ ার দেন -

'থানকাপড়, জপের থলে, কদমছাঁট মাথা
শান্তিমাসি গাইছে, আমার কৃষ্ণ কোথা যায় গো আমার কৃষ্ণ কোথা যায়
'এই বাদলায় কোথায় যাব? পাগল নাকি আমি?'
মন্দিরে নিশ্চিন্তে বসে ভাবছে শ্যামরায়'

কোন বিশেষ ছাঁচে ফেলে চিহ্নিত করা হয়, কৃষ্ণ এখানে একেবারেই সাধারণ আরাম প্রিয় বাঙালি গৃহস্থ।

ঠিক এই ধরনের না হলেও কৃষ্ণ মিথ্‌কে ভাঙার আরও বিচিত্র ধরনের চেষ্টা দেখা যায় আধুনিক কবিদের কবিতায়। এই প্রসঙ্গে কবি রূপক চক্রবর্ত্তী-র 'মজার খেলা' কবিতায় (শারদীয় দেশ, ১৪০৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৯২) কবিতাটি পুরো উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

'শুক বলে আমার কৃষ্ণ চর্চিত চন্দন
শারী বলে আমার রাধা পার্লারেতে রন
কেমন ড্রেস মেরেছে!
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপাখা
শারী বলে রাধারানির মাথটি তাতে আঁকা
ও কে যায় কি দ্যাখা!
শুক বলে আমার শ্যামের লক্ষ ছেলেপুলে
(আর) শারী বলে যায় না তারা কলেজে-ইশকুলে
নৈলে বোম বাঁধে কে।
শুখ বলে আমার কৃষ্ণ লেখে কল্পত
শারী বলে আমার রাধা সে গোলামের জ
প্রেমের ঢেউ কিশোরী-
বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের
শুক-শারী দু'জনের ঝগড়া মিটে গেল
প্রেমানন্দে ইতরজনে চোবব-চোষ্য খেল
এসো বগল বাজাই
আমরা বগল বাজাই।।'

যে বিখ্যাত বৈষ্ণব পদটির প্যারডি এই কবিতায় করা হয়েছে তা একেবারেই অর্বাচীন কালের। তার মধ্যে কৌতুক আছে চ াপল্য আছে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি দর্শনের মূল কথাটিও আছে। কৃষ্ণের তুলনায় রাধাই শ্রেষ্ঠ-এই সত্যটিই সেখানে অবিসংবাদী। কিন্তু এই কবিতাটি সেই ছন্দকে আর বাচন ভঙ্গীকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নিয়ে আজকের প্রজন্মের ম ানুষের নানাবিধ ভ্রষ্টতাকেই তুলে ধরেছে। কবিতাটির শেষের দুটি পংক্তিতে যে স্থুল কৌতুকের প্রকাশ ঘটেছে তাও এই যুগকেই এই সময়কেই চিনিয়ে দেয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com